#আমি পদ্মজা পর্ব ৮

____

আলো ফোটার পূর্বে নিদ্রা ত্যাগ করে চার মা-মেয়ে একসাথে নামায পড়ল। এরপর বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে তিন বোন পড়তে বসল। রাতভর ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষা স্নানে স্নিগ্ধ প্রকৃতি। মায়াবী সকাল। এমন সকালে কেউ ঘুমাতে চায়। আর কেউ বা বই পড়তে পছন্দ করে।
অথবা,পছন্দের অন্য যেকোনো কাজ করে। পূর্ণার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। পড়া একদমই সহ্য হচ্ছে না। পড়া থেকে উঠেই সে মনোবাসনা পূর্ণ করতে

বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাথে সাথে ঘুমে হারাল। পদ্মজা অনেক ডাকল, উঠল না। এদিকে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। হেমলতা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘পূর্ণা ঘুমে?’

‘জ্বি,আম্মা।’

‘সে জানে না স্কুল আছে। তবুও কোন আক্কেলে ঘুমাল।’

মায়ের কঠিন স্বরে পদ্মজা ভয় পেল। পূর্ণা নির্ঘাত মার খাবে আজ। সে হেমলতাকে আশ্বস্ত করে বলল, ‘তুমি যাও আম্মা। পূর্ণা কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।’

হেমলতা জানেন, পূর্ণা এতো সহজে ঘুম থেকে উঠবে না। অহরহ এমন হয়ে আসছে। যতই আদর করে ডাকা হোক না কেন, বৃষ্টিমাখা সকালে তার ঘুম ছুটানো যায় না। বাঁশের কঞ্চি পূর্ণা খুব ভয় পায়। কঞ্চির বারি না খাওয়া অবধি ঘুম পূর্ণাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এ যেন ভূত ছাড়ানোর মতো। হেমলতা বাঁশের কঞ্চি আনতে যান। এদিকে পদ্মজা ডেকেই যাচ্ছে, ‘পূর্ণা? উঠ। মারটা খাওয়ার আগে উঠ। এই পূর্ণা। পূর্ণারে...পূর্ণা উঠ। ‘

পূর্ণা পিটপিট করে চোখ খুলে আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছে। প্রেমা এই ব্যাপারটা খুব

উপভোগ করে। একটা মানুষ এতো ডাকাডাকিতেও কী করে না জেগে থাকতে পারে?

সে নিষকম্প স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বড় দুই বোনের দিকে। হেমলতা হাতে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ঘরে ঢুকেন। তা দেখে পদ্মজা পূর্ণাকে জোরে চিমটি দিল। পূর্ণা মুখে বিরক্তিকর আওয়াজ তুলে আবার ঘুমে তলিয়ে গেল।

‘তুই সর পদ্ম। ও মারের যোগ্য। পিটিয়ে ওর ঘুম ছুটাতে হবে।’

পদ্মজা মায়ের উপর কিছু বলার সাহস পেল না। দূরে গিয়ে দাঁড়ালা হেমলতা পূর্ণার পায়ের গোড়ালিতে বারি দেন।

প্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। পদ্মজা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। পা ছিঁড়ে গেছে বোধহয়। ঘুমন্ত পূর্ণার মস্তিষ্ক জানান দেয়, আম্মা এসেছেন। এবং তিনি আঘাত করেছেন। সে চোখ খোলার আগে দ্রুত উঠে বসল। চোখ খুলতে খুলতে যদি দেরি হয়ে যায়! এরপর চোখ খুলল। বোকাসোকা মুখ করে মায়ের দিকে তাকাল পরিস্থিতি বুঝতে। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসছে। প্রেমা জোরে হেসে উঠল। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই হাসি থামিয়ে দিল। পূর্ণা ভীতু কণ্ঠে বলল, 'আর হবে না আম্মা।'

'সে তো, প্রতিদিনই বলিস।'

এমন সময় ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। পূর্ণা, প্রেমা মনে মনে খুশি হলো। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। বাড়ি থেকে দুই ক্রোশ দূরে স্কুল। আম্মা নিশ্চয় যেতে না করবেন। পূর্ণা খুশি লুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা, মেঘ আসবে মনে হয়। যাবো স্কুলে?'

'মেঘ কী করল তোকে? যাবি স্কুলে।'

হেমলতা চলে যেতেই পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করল। থম মেরে বসে রইল। পদ্মজা তাড়া দিল, 'বসে আছিস কেন? জলদি কর। নয়তো আবার পিটানি খাবি।'

পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে তৈরি হলো। তিন বোন স্কুলের দিকে রওনা দিল। বর্ষাকাল

চলছে। রাতে বিরতিহীনভাবে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর কাঁদা জমেছে। পথ চলা কষ্টকর।

তিন বোন হাতে জুতা নিয়ে পা টিপে হাঁটছে। পিছলে পড়ে বই খাতা নষ্ট করার ভয় কাজ করছে মনে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। পদ্মজা পথের পাশ থেকে বড় কচু পাতা ছিঁড়ে নিল তিনটা।

তিন বোন কচু পাতায় মাথা আড়াল করল। কিন্তু দেহ ও বই-খাতা আড়াল করা গেল না। ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা বিরক্তি প্রকাশ করল, ‘ধ্যাত! ভিজে স্কুলে গিয়ে লাভ কী

আপা? দেখ,পায়জামা হাঁটু অবধি কাঁদায় আর বৃষ্টির পানি দিয়ে কী হয়েছে।'

পদ্মজা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পারছিনা কী করব! স্কুলে যাব? নাকি বাড়ি ফিরব।'
'আপা, বাড়ি যাই।'
বলল প্রেমা। পদ্মজা ভাবল। এরপর দু'বোনকে বলল, 'ভিজে তো কতবারই গেলাম। আজও যাই। সমস্যা কী?'

অগত্যা স্কুলেই যেতে হলো। স্কুল ছুটির আগেও বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি ফেরার পথ ধরল দুই

বোন।
প্রেমার এক ঘন্টা আগে ছুটি হয়েছে।
পদ্মজা নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,
‘আব্বা আসছিল স্কুলে?’
‘হ আসছিল। প্রেমারে নিয়ে গেছে।’
‘তোর সাথেও তো দেখা করল।’
পদ্মজার গলাটা করুণ শোনাল। পূর্ণার মন খারাপ হয়। আব্বা কেন তার এতো ভাল আপাকে ভালোবাসেন না?
‘পূর্ণা, পড়ে যাবি। সাবধানে হাঁট।’
পদ্মজা সাবধান বাণী দিতে দিতে পূর্ণা ধপাস করে কাঁদা মাটিতে পড়ল। পদ্মজা আঁতকে উঠল। পূর্ণার পা নিমিষে ব্যাথায় টনটন করে উঠে।

পদ্মজা পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরেও উঠতে পারছে না পূর্ণা। কাঁদো কাঁদো হয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপা, পা ভেঙে গেল মনে হয়। কী ব্যথা করছে।'

'মচকেছে বোধহয়। ঠিক হয়ে যাবে। উঠার চেষ্টা কর। আমার গলা ধরে চেষ্টা কর।'

গ্রামের পথ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। পথে কেউ নেই। গৃহস্থরা ভাত ঘুম দিয়েছে। সামনে বিলে থইথই জল। তার পাশে ক্ষেত। ডানে-বামে কাঁদামাটির পথ। পিছনে ঝোপঝাড়। পদ্মজা সাহায্য করার মতো আশেপাশে কাউকে

দেখতে পেল না। পূর্ণা পা সোজা করার শক্তি পাচ্ছে না। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা! ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে সে। পদ্মজা না পারছে পূর্ণাকে তুলতে আর না পারছে পূর্ণার কান্না সহ্য করতে। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। পদ্মজার উৎসাহে পূর্ণা মনকে শক্ত করে পায়ের পাতা মাটিতে ফেলল। সাথে সাথে শরীরে ব্যথার বিজলি চমকাল।

‘আপারে, পারছি না। আমার পা শেষ। মরে যাব আমি।’

‘এসব বলিস না। পায়ের ব্যথায় কেউ মরে না।’

আহত পা ফুলে দুই ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে। তা দেখে আতঙ্কে পদ্মজার চোখ মুখ নীল হয়ে গেল। তার কান্না পাচ্ছে খুব। পদ্মজা পূর্ণার পায়ে আলতো করে চাপ দিতেই পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'একটু সাবধানে হাঁটলে কী হতো? ইশ, এখন কী কষ্টটা হচ্ছে।'
'আপা, পা ব্যথা খেয়ে নিচ্ছে।'

পদ্মজা খুব কাছে পায়ের শব্দ পেল। চকিতে চোখ তুলে ক্ষেতের দিকে তাকাল। মুহূর্তে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে পূর্ণাকে বলল, 'পূর্ণারে, আম্মা আসছে।'

হেমলতাকে দেখে পূর্ণা কলিজায় পানি পেল। মনে হলো, মাকে দেখেই ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। হেমলতা ছুটে আসেন। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ‘কিছু হয়নি। এসব সামান্য ব্যাপার।’

এরপর পদ্মজাকে বললেন, ‘তুই বইগুলো নে।’

হেমলতা এদিকে সেলাই করা কাপড় দিতে এসেছিলেন। যার কাপড় ছিল, সে অসুস্থ। তাই যেতে পারছিল না। বাড়িতেও কোনো কাজে মন টিকছিল না। তাই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে একটা

মানুষকে সাহায্য করা ভালো। ফেরার পথে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন দুটো মেয়েকে। একটা মেয়ে পথে বসে আছে। আরেকটা মেয়ে পাশে। বিপর্যস্ত অবস্থা তাদের। মেয়ে দু'টিকে চিনতে পেরে বুক কেঁপে উঠল। পথ দিয়ে আসলে দেরি হবে। তাই তিনি ক্ষেতের পথ ধরেন।

পূর্ণা ব্যথায় যেন নিঃশ্বাস নেয়ার শক্তি পাচ্ছে না। একটা ভ্যান পাওয়া গেলে খুব উপকার হতো। দুই মিনিটের মাথায় ভ্যানের দেখা মিলল। অনেক দূরে ভ্যানের অবস্থান। ভ্যানে চিত্রা, লিখন সহ আরো দুজন।

তারা মাতব্বর বাড়িতে গিয়েছিল। যখন কাছাকাছি ভ্যানের অবস্থান তখন চিত্রা পদ্মজা আর তার মা, বোনকে দেখল। উদ্বিগ্নতা নিয়ে ভ্যান থামাতে বলল। লিখনের নজরে ব্যাপারটা আসতেই সে তাড়াহুড়ো করে ভ্যান থেকে নামল। চিত্রা আগে আগে এগিয়ে আসে। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলল, 'পূর্ণার কী হয়েছে ?'

পদ্মজা বলল, 'কাঁদায় পড়ে পা মচকেছে।'

হেমলতা, চিত্রা,পদ্মজা এবং পূর্ণাকে তুলে দিয়ে লিখন সহ বাকি দুজন

সহকর্মী ভ্যান ছেড়ে দিল। তারা হেঁটে ফিরবে।

____

পা ব্যথা অনেকটা কম লাগছে। দুটি বালিশের উপর পা রাখা। ব্রেস নেই বিধায় ব্রেসের মতো কাপড় বেঁধে দিয়েছেন হেমলতা। যা ব্যথা পেয়েছে কয়দিন বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে না। হেমলতা মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। এরপর বললেন, ‘এবার খুশি? স্কুলে যেতে হবে না। কাজ করতে হবে না। সকালে উঠে পড়তে বসতে হবে না।’

পূর্ণা রাজ্যের দুঃখ নিয়ে বলল, ‘সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি টিভি দেখতে যাব কী করে?’

কোনো সাড়া না পেয়ে পূর্ণা বুঝতে পারল, সে মুখ ফসকে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। সে বিব্রত হয়ে উঠল। ঢোক গিলল। এরপর কাঁচুমাচু হয়ে মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, ‘মোটেও খুশি হইনি।’

____

বিকেলে মগা এসে জানাল, মুন্নার বাপ খুন হয়েছে। কথাটি শোনার সাথে সাথে উপস্থিত সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল। পঙ্গু, ভিক্ষুক অসহায়

মানুষটাকে কে মারল? এমন মানুষের শত্রু থাকে? এমনই শত্রু যে, একদম মেরে ফেলল। হেমলতা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন 'কখন?'
মগা বলল, দুপুরের কথা। দুপুর দুটো কি তিনটায় গ্রামবাসী জানতে পারে এই ঘটনা। আস্তে আস্তে সব গ্রামে খবর যাচ্ছে। লাশ নোয়াপাড়ার ধান ক্ষেতে পাওয়া গেছে।

মুন্নার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। দুঃসম্পর্কের যারা আছে তারা মুন্নার দায়িত্ব নিতে চাইল না। মাতব্বর মুন্নার ভার নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুন্না পদ্মজাদের বাড়ি থাকতে চায়।

হেমলতা সানন্দে নিয়ে আসলেন মুন্নাকে।
এখন থেকে মুন্না এই বাড়ির ছেলে।
পদ্মজা, পূর্ণা খুব খুশি হলো। খুশি হলো না প্রেমা। মুন্না, প্রেমা সমবয়সী। প্রেমা ভাবছে, তার আদরের ভাগ বসাতে মুন্না এসেছে।
হেমলতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।
পদ্মজাকে বললেন, ‘প্রেমার পছন্দ হচ্ছে না মুন্নাকে। দুজনের মধ্যে সখ্যতা করে দিস। যাতে একজন আরেকজনকে আপন চোখে দেখে।’
পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,’কয়দিনে মিশে যাবে দুজন।’

পূর্ণা ব্যথায় ঘুমাতে পারছে না। প্রেমা, মুন্না ঘুমে। মুন্না খুব কেঁদেছে। এখন ক্লান্ত হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত তো কম হলো না। পূর্ণা মা-বোনের বৈঠক দেখে বলল, ‘আম্মা, মুন্নার নতুন নাম রাখা উচিৎ। ‘

‘কেন?’

‘এখন থেকে মুন্না আমাদের ভাই। আমাদের নাম প দিয়ে। তাইলে ওর নাম ও প দিয়ে হবে। তাই না আপা?’

হেমলতা হেসে বলেন,’তুই নাম রাখ তাহলে।’

‘রাখছি তো। প্রান্ত মোড়ল।’

‘মুন্নাকে জানা সকালে। রাজি হলে

এরপর সবাই নাহয় ডাকব।’
‘রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে রাজি করাব।’

হেমলতা মৃদু হাসলেন। পূর্ণা অসুস্থ হলে খুব কথা বলে। মুখ বন্ধ রাখতেই পারে না। অনেক বছর আগের ঘটনা, বা কয়েক বছর পর কি হবে তা নিয়ে অনবরত কথা বলতে থাকে।

____

গহীন অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবস্যা। হেমলতা কালো চাদরের আবরণে ঘাপটি মেরে বারান্দায় বসে আছেন। হাতের কাছে ছুরি,লাঠি। গত তিন’দিন ধরে তিনি ঘরের পাশে পায়ের

আওয়াজ শুনছেন। তখন ঘরে মোর্শেদ ছিল। একজন পুরুষ ছিল। বুকে সাহস ছিল। আজ মোর্শেদ নেই। মুন্নাকে বাড়িতে আনাতে তিনি ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই! আজ কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। হাতেনাতে সন্দেহকারীকে ধরে এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হলো কেউ আসছে না। চোখ বুজে আসছে হেমলতার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেল।

কাঁদামাটিতে ছপছপ শব্দ তুলে কেউ আসছে। হেমলতা সতর্ক হয়ে উঠেন। শক্ত হাতে লাঠি ও ছুরি ধরেন। পায়ের

শব্দটা কাছে আসতেই তিনি বেরিয়ে আসেন। অন্ধকারে পরিষ্কার নয় মুখ। আন্দাজে ছুঁড়ে মারেন হাতের লাঠি। লাঠিটা বেশ ভাল ভাবেই পড়ল সামনের জনের উপর। পিছনের জন দৌড়ে পালাল। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না হেমলতার জন্য। হেমলতা দ্বিতীয় লাঠি দ্বারা আবার আঘাত করলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির।

আহত ব্যক্তির আর্তচিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে আসে সবাই। টর্চের আলোতে চারদিক আলোকিত

হয়ে উঠল। হেমলতা স্বাভাবিক ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেন জানতেন এই লোকেরই আসার কথা ছিল। শুটিং দলকে তিনি আজই বের করবেন। তবেই শান্তি!পদ্মজা, প্রেমা, মুন্না বেরিয়ে আসে। পূর্ণা ঘরেই রইল। পদ্মজা ডিরেক্টর আবুল জাহেদকে দেখে চমকাল! তখন কোথেকে আগমন ঘটলো মোর্শেদের!

চলবে...